আহমদী ও গয়ের-আহমদীতে পার্থক্য

(আহমদী আওর গয়ের-আহমদী মে ফরক)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আহমদী
ও
গয়ের-আহমদীতে পার্থক্য

(আহমদী আওর গয়ের-আহমদী মে ফরক)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

প্রকাশক। **মাহবুব হোসেন**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর। **আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী**

প্রকাশকাল। ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
মে ২০০৯

সংখ্যা। ২০০০ কপি

মুদ্রণে। **বাড-ও-লিভস্**
২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

DIFFERENCE BETWEEN AHMADI & NON-AHMADI

Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মুখবন্ধ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই পুস্তিকায় (বস্তুত এটি একটি বক্তৃতা) তাঁর অনন্য সংস্কারের কিছু মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। যুগের নেতা হিসাবে তিনি নানা বিদাতের মূলোৎপাটনে প্রয়াসী হয়েছেন।
পুনঃপ্রকাশিত এই পুস্তিকাটির চলিতরূপদান ও প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়। মুদ্রাক্ষরিক হিসাবে কাজ করেছেন জনাব আব্দুল কুদ্দুস। মহান আলাহ সংশিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

খাকসার

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

ঢাকা
২৭ মে, ২০০৯ ইং

প্রসংগত

‘আহমদী আওর গয়ের-আহমদী মে ফরক’ পুস্তিকায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আহমদী ও গয়ের-আহমদীতে পার্থক্যের দু’টো দিককে অতি স্পষ্ট ও গুরুত্বসহ তুলে ধরেছেন। স্থুল ও সূক্ষ্ম দু’দিক সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল থেকে আমাদেরকে বৃহত্তর জনসমক্ষে তা তুলে ধরতে হবে। এতে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত সম্পর্কে অযথা সৃষ্ট নানা বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। তবে সূক্ষ্ম দিকটি অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শকে নিষ্ঠার সাথে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে প্রতিফলন ঘটানো অনেক বেশী উপলব্ধি ও সক্রিয়তার দাবী রাখে। কেননা এর উপরেই নির্ভর করে ‘পবিত্রকরণ’ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবক্ষয়মুক্ত সৎমানুষ দ্বারা সৎসমাজ তথা ‘নতুন জগৎ’ গড়া। সুখ্যাত লেখক, বক্তা ও অনুবাদক জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এই পুস্তিকার বাংলা তরজমা করে আমাদের একটি বড় অভাব পূরণ করেছেন যার ফলে দেশবাসী আহমদী ও গয়ের-আহমদীতে ব্যবধানের সঠিক মূল্যায়নে সমর্থ হবে। অনুবাদক এবং পুস্তিকার প্রকাশনার সাথে যারা যে ভাবে জড়িত তাদের সবার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করছি। হে সর্ব করুণাময় আল্লাহ তুমি তা কবুল করো। আমীন।

বিনীত

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ।

তারিখ: ২২শে মাঘ, ১৩৯৮
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশক ও অনুবাদকের কথা

আল্লাহতা'লার নির্দেশে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর কাদিয়ানে প্রথম সালানা জলসার আয়োজন করেন। বিগত ২৬, ২৭, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১ কাদিয়ানের পবিত্র ধামে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর উপস্থিতিতে এই বাৎসরিক সম্মেলন শততম জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জলসায় ৭৫ জন লোক যোগদান করেছিলেন। শততম জলসায় পৃথিবীর অর্ধশত দেশের প্রায় পঁচিশ হাজার লোক অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকেও আমরা প্রায় পৌনে দুইশত আহমদী এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

শততম জলসার পুণ্য স্মৃতি উপলক্ষ্যে ১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) প্রদত্ত ভাষণ–যা 'আহমদী আওর গয়ের আহমদী মে ফরক' নামে ইতিপূর্বে উর্দুতে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তার বাংলা অনুবাদ এ দেশবাসীর হাতে অর্পণ করলাম। আল্লাহতায়ালা কবুল করুন। আমীন।

মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব অনুবাদটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন। জাযাকুমুলাহ।

সূচীপত্র

(যে বিষয়গুলো এ পুস্তকে আলোচিত হয়েছে)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ

وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আহমদী ও গয়ের-আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য

একটি পৃথক জামা'ত সৃষ্টির কারণ

গতকাল আমি শুনেছিলাম, জনৈক ব্যক্তি বলেছিলেন, এই সম্প্রদায় এবং অন্যান্যদের মধ্যে শুধু এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই যে, এরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী, ওরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী নয়; অবশিষ্ট সকল করণীয় বিষয় যথাঃ নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ একই। অতএব বুঝা উচিত, একথা সত্য নয়– শুধু ঈসার জীবিত থাকার ভ্রান্তি দূর করার জন্য পৃথিবীতে আমার আগমন। যদি মুসলমানদের শুধু এই একটি ভ্রান্তিই থাকত তাহলে শুধু এর জন্য বিশেষ করে কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না এবং একটি পৃথক জামা'ত সৃষ্টিরও প্রয়োজন ছিল না। আর এ জন্য এত হৈ-চৈ এরও প্রয়োজন হতো না। এই ভ্রান্তি প্রকৃতপক্ষে আজ থেকে নয় বরং আমরা জানি যে, আঁ-হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের অল্পকাল পরই এটি প্রসার লাভ করে। এমনকি কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি, আওলিয়া এবং আহ্‌লুলাহরও এই ধারণা ছিল। যদি এটি কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতো তাহলে খোদাতা'লা সেই যুগেই তা দূরীভূত করে দিতেন। কিন্তু এই যুগে এমন সব কথা মুসলমানদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে যার সংশোধনও প্রয়োজন।

ঈসা (আ.) এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন নিহিত

হ্যাঁ, এর মধ্যে সন্দেহ নেই, ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর বিষয়টি এই যুগে ইসলামের জীবন লাভের ব্যাপারে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহতা'লা সকল বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান আর আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি যা চান তা করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহতা'লা এমন সব বিষয়ের চরম বিরুদ্ধে-যা ধর্মের ক্ষতি সাধন করে। ঈসা (আ.) এর জীবিত থাকার বিষয়টি প্রাথমিক যুগে শুধুমাত্র একটি ভুলই ছিল। কিন্তু আজকাল এটি একটি অজগরে রূপ নিয়েছে। যখন খৃস্টানদের ব্যাপক প্রসার ঘটল এবং তারা মসীহ্‌র জীবনকে ঈশ্বরত্বের একটি শক্তিশালী দলিল প্রমাণরূপে প্রকাশ করল এবং বলল, যদি অপর কোন ব্যক্তি এমন করতে পারে তাহলে আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এর কোন প্রমাণ উপস্থাপন কর। প্রকৃতপক্ষে যদি একথা সত্য হতো যা খৃস্টানরা বলে থাকে যে, তিনি জীবিত অবস্থায় আকাশে চলে গেছেন এবং আরশে সমাসীন হয়েছেন, তাহলে ইসলামের জন্য এটি একটি মাতমের (শোকের) দিনে পরিণত হতো। ইসলাম তৌহিদের জন্য আগমন করেছে। এটি চায় না কোন দুর্বলতা অবশিষ্ট থাকুক। খোদাতা'লা এক-অদ্বিতীয়, লা-শরীক। যদি অপর কাউকে এই বিশেষত্ব দেয়া হয়, তাহলে এতে খোদাতা'লার মর্যাদার হানি হয়। তাদের একথার দ্বারা তোমরা বিভ্রান্ত হবে না-যারা বলে, খোদা কি সর্বশক্তিমান নন? খোদাতা'লা অবশ্যই সর্বশক্তিমান। কিন্তু সমস্ত জগতে কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া-যা অপরের জন্য সম্ভব নয়, তা প্রকাশ্য শিরকের সূচনা করে। আর এ ধরনের ব্যক্তিকে প্রকারান্তরে স্রষ্টার শরীকেই পরিণত করা হয়। যেসব মুসলমান এই যুগে এই আকিদা (ধর্ম-বিশ্বাস) পেশ করে থাকে যে, ঈসা (আ.) এখন পর্যন্ত জীবিত আছে, তারা আস্তিনের অভ্যন্তরীণ শত্রু এবং ইসলামের জন্য তারা আস্তিনের অভ্যন্তরস্থ সর্পতুল্য। 'তাওয়াফ্‌ফি' এর শব্দের অর্থ যেখানে জগতের সকল মানুষের জন্য মৃত্যু, যখন ইহুদী,

খৃস্টান, মুসলমান এবং সকল সম্প্রদায়ের অভিধানে এর অর্থ মৃত্যু, তাহলে শুধু মসীহর জন্য এতে কি বিশেষত্ব রয়েছে যে, শুধু এক ব্যক্তির জন্য এই শব্দের অর্থ ভিন্ন করা হয়? এটি একটি স্থুল বিষয়। এটি এমন কোন সূক্ষ্ম বিষয় নয় যে, এর জন্য কোন বিশেষ মর্যাদাবান মুজাদ্দেদের আগমনের প্রয়োজন হতে পারে। এই 'তাওয়াফ্ফি' শব্দ যখন আমাদের নবী করিম (সা.) এর জন্য বলা হয় তখন এর অর্থ মৃত্যু ব্যতিরেকে আর কিছুই করা হয় না।

জীবিত নবী কে?

অথচ যদি কোন জীবিত নবী থেকে থাকেন তাহলে তিনি আমাদের নবী করীম (সা.)-ই। কোন-কোন বিশেষ ব্যক্তি নবী (সা.)-এর জীবনীর উপর পুস্তক লিখেছেন আর আমাদের হাতে আঁ-হযরত (সা.)-এর জীবনের প্রমাণও রয়েছে, কেননা জীবিত নবী সে-ই, যাঁর কল্যাণ এবং আশীষ প্রবাহমান। অতএব, খোদাতা'লা মুসলমানদের কখনও বিনষ্ট করেননি এবং প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে তিনি এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে আসছেন যিনি সময়োপযোগী যথাযথ সংশোধন কার্য চালিয়েছেন। আল্লাহতা'লা বলেন, 'আমরাই এই স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী (সংরক্ষণকারী)।' 'হেফাযত' শব্দটিই প্রমাণ করে, মুজাদ্দেদ সৃষ্টি হতে থাকবেন। যখন এক শতাব্দী গত হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তী বংশধরেরা গত হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তী আলেম, হাফেয, আওলিয়া এবং আবদালেরা মৃত্যুবরণ করবেন, তখন ধর্মকে সঞ্জীবিত রাখার জন্য খোদাতা'লা নিজের পক্ষ থেকে নতুন ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন। প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ ধরনের মুজাদ্দেদ হয়ে এসেছেন, যাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি, কু-প্রথা, অলসতা এবং অবহেলাকে দূর করা হয়ে থাকে। এই বিশেষত্ব শুধু আঁ-হযরত (সা.)-ই প্রাপ্ত হয়েছেন, আর এটিই তাঁর জীবিত থাকার প্রমাণ।

আঁ-হযরত (সা.)-এর আশীষের প্রভাব এমন ছিল, সাহাবারা প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন এবং আজ পর্যন্ত মানুষ এই আশীষ থেকে কল্যাণ লাভ করছে। এর বিপক্ষে হযরত ঈসা (আ.) এর প্রভাবের অবস্থা এটি ছিল, তাঁর সামনে একজন শিষ্য ত্রিশ টাকা নিয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল, আর অপর একজন–যে এক নম্বর শিষ্যরূপে পরিগণিত ছিল, মুখের উপর তিনবার অভিসম্পাত বর্ষণ করে।

অপরদিকে আঁ-হযরত (সা.) এর প্রভাব এবং কল্যাণ আর পবিত্রকরণ শক্তির ফল হলো, কুরআন শরিফের এমন হেফাযত হয়েছে, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে সহস্র লোক কুরআন শরিফ মুখস্থ করে শুনিয়ে থাকে। অপরপক্ষে ইঞ্জিলের কোন খবরই নেই যে, প্রকৃত ইঞ্জিল কোনটি এবং বিকৃত ইঞ্জিল কোনটি।

অতএব, এই বিষয়টি চিন্তা করে দেখা দরকার, হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসটি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আর মানব সন্তানের কি উপকার করেছে; কেবল একথা ব্যতিরেকে যে, চল্লিশ কোটি মানুষ মৃতের পূজারীতে পরিণত হয়েছে। অতএব প্রাচীন লোকেরা যদিও ওফাতে মসীহর বিষয়টিতে ইজতেহাদী (ধারণাগত) ভুল করে গেছেন তাহলেও তাদের পুণ্যই হয়েছে, কেননা মুজতাহিদ (চিন্তাবিদ) সম্বন্ধে লিখিত আছে, 'ক্বাদ ইউখতি ওয়া ইউসিবু'–কখনও ভুল করে এবং কখনও সঠিক করে। ঐশী প্রভাবে এদেরকে দিয়ে যা করানো হয়েছে তাঁরা এ ব্যাপারে অজ্ঞতার মধ্যে ছিলেন। খোদা যখন চান একটি রহস্য গোপন রাখেন, আর যখন চান প্রকাশ করে দেন। হ্যাঁ, এ যুগের লোকদের কাছে খোদাতা'লা এই বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে দিয়েছেন। বর্তমানে ইসলাম অধঃপতিত অবস্থায় রয়েছে এবং দিন-দিন খৃস্ট ধর্মের শিকারে পরিণত হচ্ছে। এহেন বিষয়সমূহ প্রতিদিন মানুষের কানে ফুঁক দিয়ে-দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। খোদাতা'লা এই যুগে লোকদের সর্তক করতে চান।

একজন খৃস্টানকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন তাহলে এর ফল কি হবে? এর উত্তর এই, খৃস্টধর্ম পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, খৃস্টানেরা তো মুসলমানের গর্দান কাটতে অস্ত্র ব্যবহার করছে, আর মুসলমানও নিজেদের গর্দান কাটাতে তাদের সাহায্যে দন্ডায়মান হচ্ছে।

ওফাতে মসীহ ব্যতীত অন্যান্য ভ্রান্তি

অতএব, আল্লাহতা'লা চান, এই ভ্রান্তিকে অপসারণ করেন। কিন্তু এই সিলসিলাকে প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহতা'লা আরো অনেক বিভ্রান্তি দূর করতে চান। বর্তমানে তৌহিদ শুধু মুখেই রয়ে গেছে। কোন প্রকৃত একত্ববাদী দৃষ্টিগোচর হয় না।

জগৎপূজা

প্রত্যেকটি অন্তর পার্থিব ভালবাসায় নিমজ্জিত হচ্ছে। কাউকে ধর্মের জন্য সামান্য কাজ করতে বলা হলে সে চিন্তা ভাবনায় পড়ে যায়। বর্তমানে ধর্ম অসহায়, দুর্বল এবং অনাথ হয়ে যাচ্ছে। এই কথাটি অত্যন্ত সত্য, বরকতপূর্ণ এবং ওজনদার যে, হুব্বুদ্দুনিয়া রা'সু কুলি খাতিয়াতিন অর্থাৎ- পার্থিব ভালবাসা সকল মন্দের প্রারম্ভ। অধিকাংশ লোক দুনিয়ার সাথে ভালবাসার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অন্যথায় তারা জানে, যে ধর্ম এবং পদ্ধতিকে তারা গ্রহণ করেছে, তা ভাল নয়। অধিকাংশ হিন্দু এবং আর্যসমাজী অন্তর থেকে জানে, তাদের নীতি এবং পদ্ধতি ভাল নয়। সহস্র খৃস্টান অবগত আছে, ঈসা একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না, কিন্তু পার্থিব ভালবাসা তাদেরকে কিছু করতে দেয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে খৃস্টধর্মের সাহায্যার্থে মহিলারা রয়েছে, যারা অজ্ঞ। আর 'শির্ক' এই মহিলাদের দ্বারাই শুরু হয়েছে। মহিলাদের মধ্যেই এর

অধিষ্ঠান। ইউরোপের জ্ঞানী এবং পন্ডিত ব্যক্তিরা এতে বিশ্বাসী থাকছে না এবং প্রকৃতপক্ষে খৃস্টান ধর্মটি এমনই যে, মানব প্রকৃতি এটিকে ধিক্কার দিয়ে থাকে। প্রকৃতি এটি মানতে পারে না। যদি মধ্যখানে পার্থিব স্বার্থ এবং ভালবাসা না থাকে, তাহলে এদের একটি বড় দল আজই মুসলমান হয়ে যেত। কোন-কোন লোক দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে খৃস্টান থাকার পরও অবশেষে মৃত্যুকালে এই ওসীয়্যত করে যায়, আমি মুসলমান এবং আমার দাফন-কাফন যেন ইসলাম মোতাবেক করা হয়।

ইসলাম মানুষের অন্তরে স্থান করে নিচ্ছে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার অধিবাসীরা অন্তরে-অন্তরে এই কথা অনুধাবন করছে, অন্যান্য সকল ধর্মই বাতিল, কিন্তু পার্থিব জগৎ সকলের কাছেই প্রিয়তর হচ্ছে। এটি একটি বিষ। এক মিনিট নয়, এক সেকেন্ডের মধ্যেই ধ্বংস করে দেয়। সবচেয়ে বড় পাপ যা বর্তমান যুগে সৃষ্টি হয়েছে, তা পার্থিব ভালবাসাই। এটি একটি বিষাক্ত সূক্ষ্ম কীট যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না।

নবীর আনুগত্য নেই

মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ফিরকাগুলিও ভালভাবে জানে আর অন্তরে উপলব্ধি করে, কোন ফিরকার নিয়ম-নীতি উৎকৃষ্ট এবং খোদাতা'লা বর্তমানে কিভাবে সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মন্দ। কুরআন শরীফে আছে 'কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনালাহা ফাত্তাবিউনি ইউহবিব্ কুমুলাহ'-অর্থাৎ হে নবী! তুমি বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহতা'লাকে ভালবাস, তাহলে আস! আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।' এখন দেখা উচিত, সত্যই এই সব লোক আঁ-হযরত (সা.)-কে কি অনুসরণ করে? আঁ-হযরত (সা.) কি এদের মত সুদ গ্রহণ করতেন অথবা গাফলতি করতেন অথবা মুনাফেকি করতেন অথবা দুনিয়াকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিতেন? এসব বিষয় এই লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়। আর তাদের অবস্থা সেরূপ থাকেনি–যা আঁ-হযরত (সা.) এর অনুসারীদের ছিল। উচিত ছিল, যেভাবে রাসুল করিম

(সা.) জীবন যাপন করতেন, সেভাবে জীবন যাপন করা। তাহলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যেত। এদের অন্তরে ইসলাম ধর্ম নেই। শুধু গ্রন্থে এবং পোষাকে ইসলামের উপস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। সাহাবাদের (আ.) অবস্থা এই ছিলঃ না জগৎ তাঁদের ভালবাসত না পার্থিব জগতকে তাঁরা ভালবাসতেন। তাঁরা আঁ-হযরত (সা.) এর অনুসরণে এক নতুন জীবন লাভ করেছিলেন। এখন দেখা উচিত, এসব লোকের পদক্ষেপ কি সাহাবাদের (রা.) পদক্ষেপের উপর আছে? কখনও না। অতএব, আল্লাহতা'লার ইচ্ছা– এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ যাতে সেই পথে চলে।

খোদা ভীতি নেই

আজকাল তো মানুষের অবস্থা হলো, মাত্র তিন আনার বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

উকিলেরা কি শপথ করে বলতে পারে, তারা আদালতে সত্য কথা বলে এবং সত্যের অনুসরণ করে? ওরা শুধু নিজেদের স্বার্থকে বাঁচিয়ে সত্য মিথ্যা যা কিছু সম্ভব বলতে থাকে। এই কি ধর্ম? আর খোদাতা'লা কি এই হুকুম দিয়েছেন, তোমরা লাগাম ছাড়া হয়ে যাও এবং মিথ্যাকে মাতৃদুগ্ধ জ্ঞান কর? খোদাতা'লা মিথ্যাকে শিরকের সাথে যুক্ত করে এর প্রত্যেকটিকে একইভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেমন আল্লাহকে ছেড়ে কোন-কোন ব্যক্তি মূর্তির সামনে তার মস্তক অবনত করে, সে মনে করে সে এর দ্বারাই পার হয়ে যাবে। এটা কিরূপ ক্ষতিকর বিষয়! খোদাতা'লার উপর বিশ্বাস নেই, তিনি তার জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেন। এখানে আমি আমার একটি ব্যক্তিগত ঘটনা শোনাচ্ছি।

সত্যের পরীক্ষা

একটি ঘটনা যা আনুমানিক ২৭ অথবা ২৮ বৎসর গত হতে চলল অথবা এর চেয়ে কিছু বেশি সময় পূর্বে ঘটেছে। এই অধম ইসলামের সমর্থনে আর্যদের মোকাবেলায় অমৃতসরের অধিবাসী রালিয়ারাম নামক এক খৃস্টান উকিলের ছাপাখানায় ছাপার জন্য প্যাকেট আকারে দু'দিক খোলা কভারে একটা প্রবন্ধ প্রেরণ করি। সে একটি পত্রিকাও বের করত। ঐ প্যাকেটের মধ্যে একটি চিঠিও রাখি। যেহেতু চিঠির মধ্যে এমন সব কথা ছিল যাতে ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতার দিকে ইঙ্গিত ছিল এবং প্রবন্ধটি ছাপার তাগিদও ছিল, এজন্য খৃস্ট ধর্মের বিরোধিতার কারণে সে উত্তেজিত হল এবং শত্রুতামূলক আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে গেল, কোন পৃথক চিঠি প্যাকেটের মধ্যে রাখা আইনত অপরাধ, যে ব্যাপারে এই অধমের কোন কিছু জানা ছিল না। এর কারণে ডাক বিভাগের আইনে শাস্তি ছিল ৫০০ টাকা জরিমানা এবং ছয় মাস পর্যন্ত জেল। তাই সে সংবাদদাতা হয়ে ডাক বিভাগের কর্মকর্তার কাছে এই অধমের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে দিল। রুইয়াতে আল্লাহতা'লা আমার সাথে প্রকাশ করলেন, লালিয়ারাম উকিল আমাকে দংশন করার জন্য একটি সাপ প্রেরণ করেছেন। আমি মাছের মত সেটিকে ভাজি করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি জানি এটি এরই দিকে ইঙ্গিত ছিল। অতঃপর মোকদ্দমাটি আদালতে যে পদ্ধতিতে ফয়সালা হল, তা এমনই একটি উদাহরণ যা উকিলদের প্রয়োজনে আসতে পারে।

আমাকে এই অপরাধের জন্য গুরুদাসপুর জেলা সদরে তলব করা হল আর যে উকিলের সঙ্গে মোকাদ্দমা সংক্রান্ড় পরামর্শ নেয়া হয়েছিল তারা এই পরামর্শই দিয়েছিল, মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া এথেকে অব্যাহতি পাওয়ার আর কোন পথ নেই এবং তারা এই ধরনের এজাহার দেয়ার পরামর্শ দিলেন যে, আমি প্যাকেটে কোন চিঠি রাখিনি, লালিয়ারাম স্বয়ং সেই চিঠি রেখেছে। এরপর তারা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এভাবে বয়ান দিলে সাক্ষীর উপর ফয়সালা হয়ে যাবে। দু'চারটি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারলেই খালাস।

অন্যথায় মোকদ্দমাটি খুবই কঠিন। বাঁচার আর পথ নেই। কিন্তু আমি এদের সবাইকে জবাব দিলাম, আমি কোন অবস্থাতেই সত্যকে পরিত্যাগ করব না। যা হবার তাই হবে। অতঃপর ঐ দিন অথবা অন্য দিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে পেশ করা হল এবং আমার বিরুদ্ধে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা সরকার পক্ষে বাদী হয়ে উপস্থিত হল। ঐ সময় আদালতের হাকিম স্বহস্তে আমার বয়ান লিপিবদ্ধ করলেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে এই প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এই প্যাকেটের মধ্যে এই চিঠি রেখেছিলেন? তাছাড়া এই চিঠি এবং প্যাকেট কি আপনার? তখন আমি কালবিলম্ব না করে জবাব দিলাম, চিঠি আমারই এবং প্যাকেটও আমরাই এবং এই পেকেটের মধ্যে এই পত্র রেখে আমিই তা প্রেরণ করেছিলাম, তবে আমি মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বা সরকারকে ক্ষতিগ্রস্থ করবার নিয়তে এ কাজ করিনি। প্রকৃতপক্ষে আমি এই চিঠিটিকে প্রবন্ধ থেকে আলাদা কিছু মনে করিনি আর না এর মধ্যে আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য আছে।

একথা শোনার পর আল্লাহতা'লা ঐ ইংরেজের অন্তরকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং আমার বিপক্ষে ডাক বিভাগের কর্মকর্তারা বহু শোরগোল করে লম্বা-লম্বা ভাষণ রাখলেন, যা আমার বোধগম্য হয়নি। শুধু এতটুকুই বুঝেছিলাম, প্রত্যেকটি বক্তব্যের পর ইংরেজী ভাষায় ঐ হাকিম নো-নো বলে তাদের সমস্ত কথাকে রদ করে দিচ্ছিলেন। পরিণামে বাদী অফিসারটি যখন তার সমস্ত বক্তব্য সমাপ্ত করল এবং তার সকল মনের জ্বালা মিটালো, তখন হাকিম রায় লিখতে মনোনিবেশ করলেন এবং এক কি দেড় ছত্র লিখে আমাকে বললেন, 'আচ্ছা' আপনি যেতে পারেন।' একথা শুনে আমি আদালত কক্ষ থেকে বের হলাম এবং আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদ প্রভুর কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম, যিনি একজন ইংরেজ অফিসারের মোকাবেলায় আমাকে জয়যুক্ত করলেন। আর আমি ভাল করেই জানি, ঐ সময় সত্যতার কল্যাণেই খোদাতা'লা এই বিপদ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আমি ইতোপূর্বে স্বপ্নও দেখেছিলাম, জনৈক ব্যক্তি আমার টুপি খুলে নেয়ার জন্য হাত লাগিয়েছে। আমি বললাম, 'এ কি করছ? তখন সে টুপিটি আমার মাথায় রেখেই বলল, 'যথার্থ।' সময়

চলে যায় কিন্তু কথা স্মরণ থাকে। এই ডাক-বিভাগীয় মোকদ্দমায় আমি আল্লাহর পক্ষ অবলম্বন করেছিলাম, তাই তিনি আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। খোদাতা'লা মিথ্যার জন্য কোন মুক্তির ব্যবস্থা করেন না। মিথ্যার চাইতে জঘন্য আর কোন বিষয় নেই। সত্য সম্বলিত প্রত্যেকটি কথাই জয়যুক্ত হয়ে থাকে। আমার উপর সাতটি মোকদ্দমা তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটিতে খোদা আমাকে জয়ী করেছেন। কোন-কোন লোক বলে, ঐ ব্যক্তি তার মোকদ্দমায় সত্যবাদী ছিল কিন্তু তবুও সে শাস্তি পেয়ে গেল। প্রকৃত কথা হলো, যারা এভাবে শাস্তি পায় তারা প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন মিথ্যার জন্যই তা পেয়ে থাকে।

খোদাতা'লার কাছে একটি ধারাবাহিক হিসেবের ব্যবস্থা থাকে। বাটালায় মৌলভী গুল আলী শাহ্ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে শের সিং এর ছেলের শিক্ষক ছিল আর শের সিংহ একজন সাংঘাতিক যালেম হাকিম হিসেবে কুখ্যাত ছিল। একবার এক বাবুর্চিকে একটি সামান্য অপরাধের কারণ যেমন, হাড়িতে বেশি লবণ পড়ে গিয়েছিল এজন্য শের সিং কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। মৌলভী সাহেব সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। শের সিং তাঁর সম্মানও করত এবং খাতির তোয়াজও করত। এজন্য মৌলভী সাহেব সরাসরি তার সাথে কথাবার্তা বলতে পারতেন। ঐ সময় মৌলভী সাহেব শের সিংকে বললেন, আপনি লঘু পাপে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিলেন? সে জবাবে বলল, আপনি জানেন না, এই ব্যক্তি আমার ১০০ টি ছাগল চুরি করে খেয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষ অন্য কোন ক্ষেত্রে পাপ করে আর ধরা পড়ে আরেক ক্ষেত্রে। মানুষের সকল মন্দকর্মকে পুঞ্জীভূত করে রাখা হয়, যার ফল তাকে ভোগ করতে হয়। যারা সততাকে পাকাপোক্তভাবে অবলম্বন করে এবং খোদার জন্য হয়ে যায় খোদা তাদের হেফাযত করে থাকেন। খোদার ন্যায় কোন দুর্গ নেই। অর্ধেক বিষয় কোন কাজে আসে না। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যদি দুই-এক টুকরা রুটি খাইয়ে দেয়া হয় তাহলে এর দ্বারা সে বাঁচতে পারে না। ত্রুটিপূর্ণ কর্ম খোদাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এটি দুনিয়ার ধোঁকা। সত্যবাদী রাসুলগণ এমন কাজ করেন না বরং তাঁরা নৈপুণ্য লাভ করে থাকেন।

তুমি কর্মে নিপুণ হলে জগতে প্রিয় হবে,
হে প্রিয় বন্ধু! জগতে অনভিজ্ঞের কোন মূল্য নেই।

একটি ঔষধ জানলেই কেউ চিকিৎসক হয় না আর একটি কাপড় সেলাই করে কেউ দর্জি হয়ে যায় না। মানুষেরা নিজেরাই দুর্বলতা দেখায়–পরে খোদার উপর অভিযোগ দেয়। আর অল্প-স্বল্প ভাল কাজ করে বাহবা নিতে যাওয়া অভদ্রতার মধ্যে গণ্য।

‘মুখলিসিনা লাহুদ্দিনা’ হওয়া উচিত। দুনিয়ায় দান খয়রাত করে মানুষ বাহবা চায়। যদি রিয়া (লোক দেখানো কর্ম) না হত তাহলে মানুষ অল্প দিনেই ওলী হয়ে যেতে পারত। যে ব্যক্তি তার তুচ্ছ কাজ দ্বারা খোদাকে ধোঁকা দিতে চায় সে নিজেই ধোঁকাতে পতিত হয়। পৃথিবীতে একজন বুদ্ধিমান মানুষ কারো ধোঁকায় পড়তে চায় না, তাহলে খোদা কিভাবে ধোঁকায় পড়বেন? বরং মন্দ কর্মের ভিত্তি দুনিয়া পূজা। আর বর্তমানে সব চাইতে যে বড় পাপ মুসলমানদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে তা-ও পার্থিব ভালবাসা-ই। শয়নে-স্বপনে সর্বাবস্থায় দুনিয়ার চিন্তা লেগেই আছে। যদি এ ধরনের ভাবনা-চিন্তা ধর্মের জন্য করা হতো তাহলে সবাই তরী পার হয়ে যেত। কর্মচারীরা তাদের চাকুরীর ব্যাপারে খুবই তৎপর থাকে, কিন্তু যখন নামাযের সময় আসে তখন চিন্তায় পড়ে যায়। খোদার গৌরবকে অন্তরে স্থান দেয়া উচিত। অধিকাংশ লোক হাতলের মধ্যে সরিষা জমাতে চায়। ধর্মের ব্যাপারে বছরের পর বছর ধৈর্য ধারণ করলে কাজ হয়ে থাকে। শুধু ফুঁ দিলেই কাজ হয়ে যায় না।শ্ছ খোদাতা’লা বলেন, এরা কি চায় যে, এরা মুখে বলে দিয়েছে, আমরা ইমান এনেছি আর এর পরীক্ষা করা হবে না? যদি এই নিয়মই হতো ফুৎকার দিলেই সবাই ওলী হয়ে যেত তাহলে পয়গম্বরে খোদা (সা.)-এরূপই করতেন এবং নিজের সাহাবীদের পরীক্ষায় ফেলে তাদের শিরোে দ করার-ই বা কি প্রয়োজন ছিল? ওরা নির্বোধ–যারা মনে করে, ঐশীজ্ঞান লাভ করা খুবই সহজ। প্রত্যেক কল্যাণ লাভের জন্যই সাধনা চাই।

হিন্দুদের মধ্যে দেখ! কেমন ত্যাগ ও উপবাসের মাধ্যমে যোগীরা চূড়ান্ত কষ্ট সহ্য করে থাকে! খৃস্টানদের মধ্যেও সংসারত্যাগী রয়েছে। ইসলামে খোদাতায়ালা এ ধরনের কিছু রাখেননি। আর এ ব্যাপারে জোরও দেননি। বরং এই হুকুম রয়েছে- ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা, মুক্তি সে-ই লাভ করবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে। আর বিদা'ত, অবাধ্যতা, অশীলতা, চুরি, মিথ্যা এই সব পরিত্যাগ করে খোদার জন্য পৃথক হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিবে সে খোদার সাথে মিলিত হবে। নিজের অস্তিত্বকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। খোদাকে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাধান্য দিতে হবে। এটাই ধর্মের সার। যত মন্দ পথ আছে তা সবই পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলেই খোদা পাওয়া যাবে।

আল আমালু বিন নিয়ত

দুনিয়াতে কোন জিনিসই মন্দ নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিষ মন্দ প্রয়োগের ফলেই মন্দে পরিণত হয়। অন্যথায় রিয়াও (লোক-দেখানো কর্ম) খারাপ কিছু নয়। যদি খোদার জন্য কেউ রিয়া করে তাহলে সেটিও পুণ্য কর্ম। এর উদাহরণ এভাবে দেয়া যায়, যখন কোন ব্যক্তি দান করে এবং লোকদের সামনে করে এবং অন্তরে এই নিয়ত রাখে, এর ফলে মানুষ আমার প্রতি সন্তুষ্টই থাকবে–তখন এটি পাপ, কিন্তু যদি অন্তরে এই ধারণা পোষণ করে, আমার দান দেখে মানুষের অন্তরেও পুণ্যের সৃষ্টি হবে আর সে-ও এভাবে দান করবে, তাহলে এই রিয়া কর্ম বৈধ এবং পুণ্যের কারণ হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ লোকদের সামনে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে তাহলে এটি রিয়া হবে। কিন্তু যে নামায সৎলোকের সঙ্গ লাভ করে ফল লাভ করার জন্য এবং খোদা ও রাসুলের হুকুম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে পাঠ করা হয়, তাতে পুণ্য হয়। অতএব মসজিদে নামায পড় এবং ঘরেও নামায পড়। অনুরূপভাবে নৈতিকতাও স্থান কাল ভেদে বিবেচিত হয়। হাদিসে আছে যে, এক ব্যক্তি কাফেরদের মোকাবেলায় বুক টান করে বের হল। আঁ-হযরত (সা.) বললেন, যদিও বুকটান করে পথ চলা খোদাতা'লা পসন্দ করেন না– কিন্তু এই সময়ে এই

ব্যক্তির বুক টান পসন্দ করা হয়েছে।' প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লা কোন বস্তুই মন্দরূপে তৈরী করেননি। মন্দ ব্যবহারেই বিভিন্ন বস্তু মন্দে পরিণত হয়। তোমরা চেষ্টা কর যেন প্রত্যেকটি শক্তি যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়।

ইসলামের শিক্ষা প্রকৃতিসম্মত

ইসলামের শিক্ষাই এমন, এটি এর প্রত্যেকটি শক্তিকে যথাস্থানে ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়। সেই সব লোকের জন্য পরিতাপ যারা শুধু মিষ্টি কথার ধোঁকায় পড়ে যায়। সত্য সবসময় সর্বাবস্থায় সকলের জন্য মিষ্টি হয় না। যেভাবে মা সবসময় সন্তানকে খাবার জন্য মিষ্টি দেয় না বরং প্রয়োজনের সময় তিক্ত ঔষধও দিয়ে থাকে, একজন সৎ ও সত্যবাদীর অবস্থাও অনুরূপ। সবদিক দিয়ে কল্যাণকর এই শিক্ষা। খোদা এমন, তিনি সত্য খোদা। আমাদের খোদার উপর খৃস্টানেরাও বিশ্বাস রাখে। খোদাতা'লার যেসব গুণাবলী আমরা স্বীকার করে থাকি তার সবগুলোকেই মানতে হয়। পাদ্রী ফিন্ডার তার পুস্তকের এক জায়গায় লিখেছেন, যদি কেউ এমন একটি দ্বীপে থাকে যেখানে খৃস্টধর্ম প্রবেশ করেনি, কেয়ামতের দিন সেখানকার লোকদের সেক্ষেত্রে কি প্রশ্ন করা হবে? এর উত্তর তিনি নিজেই দিচ্ছেন, তাদের এমন প্রশ্ন করা হবে না, তোমরা যীশু এবং তার অস্বীকারকারীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে, না করনি? বরং তাদের এই প্রশ্ন করা হবে, তোমরা ঐ খোদাকে মান্য কর যে ইসলামের মতে এক এবং অদ্বিতীয়। ইসলামের খোদা সেই খোদা। প্রত্যেক জঙ্গলের অধিবাসীও প্রকৃতিগত কারণে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেক এবং অন্তর্জ্যোতি সাক্ষ্য দেয়, সে ইসলামী খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুক।

ইসলামের সত্যতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের কাজ

এই ইসলামের সত্যতা এবং প্রকৃত শিক্ষাকে, যা-বিকৃত করা হয়েছে, আজকাল মুসলমানরা ভুলে গেছে, তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের কাজ। আর সেই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আগমন করেছি।

জ্ঞানমূলক বিশ্বাসগত ভ্রান্তির সংশোধন

উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে সেসব বিষয় ছাড়াও আরও জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিশ্বাসগত ভুলভ্রান্তি মুসলমানদের মধ্যে প্রসার লাভ করছে যার সংশোধন করা আমাদের দায়িত্ব। যেমন এদের বিশ্বাস হল, ঈসা (আ.) এবং তাঁর মা শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র এবং অন্যান্য সব নবী (নাউযুবিলাহ) পবিত্র নন। এটি একটি সুস্পষ্ট ভ্রান্তি বরং কুফরী। আর এ দ্বারা আঁ-হযরত (সা.) এর ভয়ানক অপমান হয়। এদের মধ্যে সামান্য আত্মমর্যাদাবোধও নেই, এরা এ ধরনের ধর্মীয় নীতি তৈরী করে নিয়েছে আর ইসলামকে অপমান করার চেষ্টা করছে। এরা ইসলাম থেকে অনেক দূরে। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি কুরআন শরিফে এভাবে পাওয়া যায়, জন্ম দু'ভাবে হয়ে থাকে। একটি রূহুল কুদুসের স্পর্শ দ্বারা; অপরটি শয়তানের স্পর্শ দ্বারা। সকল পুণ্যবান এবং সৎপথপ্রাপ্ত লোকের সন্তান পবিত্র আত্মার স্পর্শে জন্ম নেয় এবং যেসব সন্ড়ান মন্দ কর্মের ফলে জন্ম নেয় তারা শয়তানের স্পর্শে জন্ম নেয়। সকল আম্বিয়া-ই পবিত্র আত্মার স্পর্শে জন্ম নিয়েছেন কিন্তু যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে ইহুদীরা এই অপবাদ দিয়েছিল যে, (নাউযুবিলাহ) এটি ব্যভিচারের ফল এবং পান্ডার নামক এক সৈনিকের সঙ্গে মরিয়মের অবৈধ সম্পর্ক ছিল; ফলে এটি শয়তানী স্পর্শের ফল। এজন্য আল্লাহতা'লা নিজের উপর আরোপিত এই অপবাদ দূরীকরণার্থে তাঁর সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দিলেন, এঁর জন্মও পবিত্র আত্মার পরশে হয়েছে। যেহেতু আমাদের নবী করিম (সা.) এবং অপরাপর নবীদের সম্বন্ধে এ ধরনের কোন অপবাদ ছিল না সেজন্য তাঁদের সম্বন্ধে এ ধরনের বর্ণনা দেয়ার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

আমাদের নবী করিম (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ এবং মাতা আমিনাকে প্রথম থেকেই সব সময়ে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে আর তাদের সম্বন্ধে এ ধরনের ধারণা কারো কখনও হয়নি। এক ব্যক্তি যখন মামলায় গ্রেফতার হয় তখন তার জন্য সাফাই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন মামলায় গ্রেফতার হয়নি, তার জন্য কোন সাফাই বা সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না।

মিরাজের তাৎপর্য

অনুরূপ আরো একটি ভ্রান্তি–যে সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রান্তি প্রসার লাভ করেছে তা হল মিরাজ। আমাদের বিশ্বাস, আঁ-হযরত (সা.)-এর মিরাজ হয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন-কোন লোকের ধর্মীয় বিশ্বাস হলো, এটি একটি সাধারণ স্বপ্ন ছিল; তা ভুল। কিন্তু যেসব লোকের বিশ্বাস এই, মিরাজে আঁ-হযরত (সা.) জড়দেহসমেত সপ্তম আকাশে চলে গিয়েছিলেন–তাদের বিশ্বাসও ভুল। বরং প্রকৃতপক্ষে আসল বিষয় হল, মিরাজ কাশ্ফি (দিব্য-দর্শন) রঙে এক জ্যোতির্ময় সত্তায় হয়েছিল। এটি একটি অস্তিত্ব। তবে জাগ্রত অবস্থায় ছিল কাশফি এবং জ্যোতির্ময়রূপে। যা এ জগদ্বাসী বুঝতে অপারগ। কিন্তু যাদের উপর এই কাশ্ফি অবস্থা হয়েছে তারাই এটা বুঝতে পারে। অন্যথায় জড় দেহে এবং সুস্পষ্ট জাগ্রত অবস্থায় আকাশে যাওয়ার জন্য তো স্বয়ং ইহুদীরাই মোজেযা হিসেবে দেখাতে বলেছিল, যার উত্তর কুরআন শরিফে দেয়া হয়েছে:- কুল সুবহানা রাব্বি, হাল কুনতু ইলা বাশারার রাসুলা- বলে দাও, আমার প্রভু পবিত্র, আমি তো একজন মানব-রাসুল মাত্র। মানুষ কখনও এভাবে উড়ে আকাশে যায় না। খোদার এই রীতিই আদিকাল থেকে চালু আছে।

কুরআনের উপর হাদিসের প্রাধান্য নেই

মুসলমানদের আরো একটি ভ্রান্তি হলো, তারা হাদিসকে কুরআন শরিফ দৃঢ় বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে আর হাদিসের মর্যাদা আনুমানিক। হাদিস বিচারক নয় বরং কুরআন তার উপর বিচারক। হ্যাঁ, হাদিস কুরআন শরিফের ব্যাখ্যা, তাকে তার স্থানে রাখা উচিত। হাদিসকে ঐ সীমা পর্যন্ত মানা উচিত, যে পর্যন্ত না কুরআন শরিফের বিরুদ্ধে যায় এবং তার অনুরূপ যেন হয়। কিন্তু যদি বিপক্ষে যায় তাহলে তা হাদিস নয় বরং প্রক্ষিপ্ত বাক্য। কিন্তু কুরআন শরিফ বুঝার জন্য হাদিসের প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন শরিফে যে ঐশী বিধান নাযিল হয়েছে আঁ-হযরত (সা.) তা কর্মের মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন এবং একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন। যদি এই উদাহরণ না থাকত তাহলে ইসলাম বোধগম্য হত না। কিন্তু মূল হল কুরআন। কোন-কোন আহ্‌লে কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শী) আঁ-হযরত (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি হাদিস শুনে থাকেন, যা অন্যেরা জানে না; অথবা তারা বর্তমান হাদিসগুলির সত্যতা যাচাই করে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের বহু বিষয় এদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, যে সম্বন্ধে খোদাতা'লা অসন্তুষ্ট এবং যা ইসলামী ভাবমূর্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য আল্লাহতা'লা এখন এদের প্রকৃত মুসলমান জ্ঞান করেন না, যতক্ষণ না তারা এই ভুল বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সঠিক পথে আসবে আর এই উদ্দেশ্যেই খোদাতা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যাতে আমি এই সব ভুল-ভ্রান্তি দূর করে প্রকৃত ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি। এই হল পার্থক্য–যা আমাদের এবং তাদের মধ্যে রয়েছে। তাদের অবস্থা ইসলামসম্মত নয়। এদের অবস্থা একটি নষ্ট অপ্রয়োজনীয় বাগানের মত হয়ে গেছে। তাদের অন্তর অপবিত্র হয়ে গেছে আর খোদাতা'লা চান, একটি নতুন জাতির সৃষ্টি হোক–যারা সত্য এবং সততাকে অবলম্বন করে প্রকৃত ইসলামের আদর্শে পরিণত হয়।

Difference between Ahmadi and Non Ahmadi

Soliciting worldly pleasure is the greatest obstruction in the way of God. Idol worship and social malpractices derail man from the correct path.

God-chosen Imam has the responsibility of guiding people to the original and pristine heavenly teachings.

In this article Hadhrat Imam Mahdi (as) discusses the difference between his followers and the general Muslims.

Only divine light can remove the worldly darkness.

Difference Between Ahmadi & Non-Ahmadi
by **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah & Imam Mahdi as
translated into bengali by
Alhaj Ahmad Tawfiq Chowdhury
published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-991-019-0